OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 01 - 06
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নারীর বয়ানে নারীর ভাষ্য : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

সুকন্যা মাইতি
গবেষিকা
বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sukanyamaiti2025@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
women's distinct language, women's commentary, stereotype, communication style, language, men, women, women's, presentation attitude.

Abstract
Like other female-led poems of the Middle Ages, women have also gained prominence in Baru Chandidas' 'ShriKrishnakirtan'. There is also own dialogue of women. Therefore, the analysis of women's language in the context of their own dialogue deserves a discussion. The two main women whose dialogues cover a wide range in the poem under discussion are - Radha and Barai. Numerous differences are observed between the words of women and men throughout the poem. Where the tone of women is soft and pleading, in most cases the seriousness of men is evident. Where the male character Krishna expresses his thoughts directly and clearly, the female characters, in most cases, resort to deception, keeping in mind the knowledge of time, and present them in a very elaborate manner. Similarly, various topics used in the words of Radha and Barai have emerged, which are distinct from the male language. The abundance of two-syllable and phonetic words, the dramatic presentation of words, the abundance of proverbs and sayings, the use of similes, etc., are used uniquely in women's language. And in the main discussion, all these issues have been discussed extensively with examples. In this context, it can be seen that women's language has moved away from men's language and has taken its place as a separate dialect. In the poem 'Shrikrishnakirtan', a description of women's language in early-Central Bengal has been developed through the women's own narration.

Discussion

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আদি-মধ্য বাংলার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের মতোই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নারী প্রধান কাব্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় এর মূল উপজীব্য হলেও কিংবা শিরোণামে কৃষ্ণের প্রাধান্য থাকলেও এ কাব্যের সকল রস আত্মসাৎ করেছে রাধা। শুধু রাধা নয়, বড়াইও এই কাব্যের এক অন্যতম আকর্ষণ। তাই নারী প্রধান কাব্য হিসেবে, নারীর ভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। কাব্যে ভাষার যে বৈচিত্রময় রূপ ফুটে উঠেছে, তা হল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষা। আলোচ্য কাব্যে কবি সুনিপুনভাবে নারী-পুরুষের ভাষার তারতম্য উপস্থাপন করেছেন, যা একদম বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। নারী না হয়েও নারীর কথনকে খুব নিঁখুতভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। কবির বিবৃতিতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 06
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নয়, নারীর নিজস্ব কথনের প্রেক্ষিতেই নারীর ভাষা অনুসন্ধানের চর্চায় অগ্রসর হব। উক্ত কাব্যে প্রধানা দুই নারী - রাধা ও বড়াই এর নিজস্ব বয়ানকে সামনে রেখে নারী ভাষ্যের আলোচনায় প্রয়াসী হব।

প্রাথমিকভাবে, নারী ভাষার যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হল কথা ও সুরের কোমলতা। যেখানে পুরুষের কথায় গাম্ভীর্য ও বীরত্ব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ, আলোচ্য কাব্যেও দেখি কৃষ্ণের উক্তিতে গাম্ভীর্য, বীরত্ব ও অহংকার প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ বার বার নিজেকে 'দেব চক্রপাণি' বলে প্রতিপন্ন করেছে। সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাধার কথনে বার বার অনুনয়ের কোমল সুর প্রকট হয়েছে। যেমন –

> "চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোহ্মারে।
> ছাড় একবার কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘরে।।"[১] (দানখণ্ড)

সুতরাং, উভয়ের ভাষার সুরের পার্থক্য একেবারে বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাব্যে কোনো কোনো স্থানে এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর পরিসর একেবারেই কম। এরূপ একাধিক বিষয় রয়েছে যা নারীর ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য কাব্যে রাধা ও বড়াই এর কথনে শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটি শব্দদ্বৈত হল – 'খনে খনে', 'নিতি নিতি', 'না বোলো না বোলো', 'দিঠী দিঠী', 'নিষধ নিষধ', 'চমকী চমকী', 'না জীবোঁ না জীবোঁ', প্রভৃতি। কাব্যে নারী ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ হল – 'আনমনে', 'খলখলি', হুলাহুলী', 'টলবল' প্রভৃতি। কাব্যে কৃষ্ণের কথনে বিলক্ষণ কোথাও এরূপ শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নারী ভাষার আর একটি দিক হল – কথাকে গুছিয়ে, যুক্তি দিয়ে, কালজ্ঞান মাথায় রেখে সুকৌশলে উপস্থাপন করা। আবার অনেক সময় মূল কথাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলা। আলোচ্য কাব্যে সুচতুর বড়াইয়ের কথনে তা একেবারে স্পষ্ট। তাম্বুলখণ্ডে, রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেরিত তাম্বুল বড়াইকে ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণকে সুরতির আশা ত্যাগ করার কথা জানাতে বলেন, বড়াই তখন সুকৌশলে তা ব্যক্ত করেন। এরপর কৃষ্ণ এই সংবাদ পেয়ে রাধার দর্শন প্রার্থনার কথা বড়াইকে জানাতে বললে, বড়াই অনেক দীর্ঘায়িত করে তা রাধার কাছে উপস্থাপন করেন। রাধাবিরহের কয়েকটি পদেও দেখা যায়, রাধার কৃষ্ণ-বিরহের করুণ অবস্থাকেও বড়াই কৃষ্ণের কাছে আরও অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিপুনতার সঙ্গে ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর উদ্দেশ্যে সহজেই সফল হতে পারেন। এটি নারী ভাষার এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এরূপ কথন বৈশিষ্ট্য কিন্তু কাব্যমধ্যে পুরুষের কথন তথা কৃষ্ণের কথনে কোথাও পাই না। কৃষ্ণের কথনে দেখা যায়, তাঁর মনের ভাব তিনি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

নারী ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, কথায় কথায় নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য হাহাকার করা, নিজেকে ধিক্কারর দেওয়া, বিধাতাকে দোষারোপ করা, আবার অনেক সময় কথায় কথায় নিজের মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করা। আলোচ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার কথনে এরূপ একাধিক বার উচ্চারিত হয়েছে – 'ধিক জাউ নারীর জীবন', 'তেকারণে বিধি...দুখগণ লেখিল সাঠীহারে', 'আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী', 'ধিক জাউ নারীর যৌবন', 'হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল', ' নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধি' ইত্যাদি। নারীর কথায় কথায় মরণের ইচ্ছা প্রকাশ করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। যেমন - 'হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ', 'সাগর সঙ্গম জলে তেজিবোঁ মো কলেবরে তথাঞিঁ মরিবো কিবা খাইবোঁ গরলে', 'বাঘ ভাল্লুকে রা আহ্মার খাউ। কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ।' 'যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে। তবে লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে।' ইত্যাদি। বড়াইও যেহেতু একজন নারী তাই তাঁর কথনেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে– 'বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে', 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে' ইত্যাদি।

আমাদের সমাজে নারীর কথায় কথায় অভিসম্পাত দেওয়ার ব্যাপারটি রাধার কথনেও লক্ষ্য করা যায়। তা অপরকে হোক বা নিজেকে, এরূপ কথন বৈশিষ্ট্য কিন্তু নারীর ভাষাতেই পাওয়া যায়। বংশীখণ্ডের একটি পদে রাধা বলেছেন–

"চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী। যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী।।
যবেঁ মো চুরি কৈলোঁ হঁআ নারী সতী। তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতি।।"[২]

সমাজে নারীদের বিভিন্ন ব্রত-অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। যা তাদের আগামী জীবনের আশীর্বাদস্বরূপ বলে মনে করা হয়। কাব্যে রাধা একাধিক বার উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বজন্মে খণ্ডব্রত করার কারনে বিধাতা তাঁকে দুখিনী করেছেন, কিংবা এই কারণেই তিনি কৃষ্ণকে হারিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর কথায় আরও এরূপ কথা উঠে এসেছে। যেমন- 'আর তার মুখ দেখিঁতে না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে', 'জরম গেল করমের খণ্ড কাল কাহ্নায়ির হাথে' ইত্যাদি। নারী মনে যেহেতু জীবনের প্রথম থেকেই এই সকল ধারণার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেওয়া হয়, তাই তারা এই সব কু-সংস্কার, বিশ্বাসকে একেবারে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে থাকে।

এ সকল উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, তৎকালীন বাঙালি নারী জন্মান্তর, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে যথেষ্ট বিশ্বাসী ছিল। অসহায় নারী সমাজে অবহেলিত হওয়ার কারনে স্থান-যোগ্যতা-ক্ষমতায় পিছিয়ে থাকায়, নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করে। আর এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে নিজের মৃত্যু কামনা করে থাকে। অনেক সময় এর মধ্য দিয়ে তাদের অভিমানের দিকটিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আর এ সব কিছুর প্রতিফলন তাদের কথার মধ্যে ফুটে ওঠে। বর্তমান সমাজেও নারী মনস্তত্ত্বের এই চিত্র একেবারে বিরল নয়। কিন্তু কাব্যমধ্যে কৃষ্ণের কথনে এরূপ ভাষ্য একেবারেই বিরল।

আমাদের সমাজে একজন গৃহবধূর কাছে তাঁর স্বামী ও শ্বাশুড়ির অত্যাচারকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করা হয়। কাব্যমধ্যে বড়াইয়ের কথনেও সেই চিত্র আমরা অনুমান করতে পারি। যদিও বড়াই এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবতী, কারণ তাঁর ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটেনি –

"কোঁপে কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল সামী।
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী।।"[৩]

'গালাগালি'র পরিচয় আমাদের সমাজে ছেলেদের ভাষায় যতটা পাওয়া যায়, মেয়েদের ভাষায় ততটা পাওয়া যায় না, বা তার উপস্থাপন একটু ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে মেয়েদের ভাষায়, ছেলেদের ব্যবহৃত গালাগালের প্রয়োগ দেখা যায়, তবে তুলনামূলকভাবে তার পরিমাণ অনেক কম। ছেলেরা গালাগালি দিলে তা তাদের পৌরুষত্বের পরিচায়ক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই একই নীতি নারীর ক্ষেত্রে খাটে না। পরিবর্তে সেই নারীকে এরূপ শব্দ ব্যবহারের জন্য পরিবারে কঠোর শাসন করা হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কৃষ্ণ অকপটেই রাধাকে 'নঠী বড় রাধা', 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী' বলে গালাগালি দিয়েছেন। কিন্তু বড়াই বা রাধার কথনে কোথাও এরূপ কোনো শব্দের উল্লেখ পাই না। কিন্তু তাই বলে রাধা একেবারে নীরব থাকেননি। কৃষ্ণকে তাঁর 'গোত্র' তুলে কিংবা 'বাপ' তুলে গালাগালি দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলেছেন–

'কাহাক দেখাও এ কাঠদাপে। বান্ধিতে না পারে তোহ্মার বাপে।'[৪]

তাম্বুলখণ্ডের একটি পদে বড়াইকেও রাধা একই ভঙ্গিতেই বলেছেন –

'দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহি লাজ।'[৫]

এখানে বঙ্গদেশের গ্রাম্য নারীর নিজস্ব ভাষা স্বরলাভ করেছে।

সতীত্বের ধারণা নারীর জন্য এক কঠিন সংস্কার। কোনো কোনো নারীকে সতী বললে সে যেন পরম পারিতোষিক পাওয়ার আনন্দ অনুভব করে। আবার এই 'সতী' শব্দের ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই কোনো নারীকে একেবারে দুর্বল করে নীচে নামিয়ে আনা যায়। নারী যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই নারীর পরম শত্রু, তাই এই শব্দের আঘাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপর এক নারীর কাছ থেকেই একজন নারী পেয়ে থাকে। তাই, আলোচ্য কাব্যেও দেখি বড়াই, রাধার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েও কৃষ্ণের সম্মুখে রাধার সম্পর্কে বলেছেন –

"সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।"[৬]

আবার লজ্জাকে যেহেতু নারীর একমাত্র ভূষণ বলে মনে করা হয়, একজন নারী তাই অনায়াসেই অন্য একজন নারীকে এই শব্দের প্রয়োগে তিরস্কার করতে পারে। বড়াইও কাব্যে সেইরূপ রাধাকে তিরস্কার করে বলেন –

"নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক পাপমতী না বাসসি লাজে।"[৭]

সামাজিক বিধিনিষেধ বা 'ট্যাবু'র ব্যবহার নারী ভাষার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর মূলে থাকে কিছু সংস্কার, বিশ্বাস, কুসংস্কার বা ধারণাগত অস্বচ্ছতা। এটা শুধু নারীর নিজস্ব সম্পদ নয়, সব স্তরের মানুষেরই এর ওপর অধিকার আছে। তবে, নারীর কথনেই এর প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। আলোচ্য কাব্যে আমরা রাধার কথনে বেশ কিছু এই ট্যাবুর প্রয়োগ দেখতে পাই। বংশীখণ্ডের একটি পদে রাধা তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে জানান –

"কোন আসুভ খনে পাত্ত বাঢ়ায়িলোঁ। হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ।।
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ। বাঁঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।।
কথো দূর পথে মো দেখিলোঁ সগুনী। হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গঁএ যোগিনী।।
কান্ধে কুরুঅ লআঁ তেলী আগে জাএ। সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ।।"[৮]

অর্থাৎ রাধা, হাঁচি, টিকটিকির বাধা মানেননি, হোঁচট খাওয়াকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর সামনে দিয়ে সখীরা শুন্য কলসী নিয়ে গিয়েছিল, বাম দিকের শেয়ালকে দান দিকে যেতে দেখেন, হাতে খর্পর নিয়ে এক যোগিনী ভিক্ষা করছিল, কাঁধে তেলের পাত্র নিয়ে এক তৈলিক তাঁর আগে আগে গিয়েছিল, শুকনো ডালে কাক বসে ডেকেছিল – আর এই সকল জিনিসকে নারীরা তাদের জীবনে অশুভ সংকেত বলে মনে করে। আর এই বিশ্বাস, সংস্কার তাদের ভাষাতেও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়। যা রাধার এই কথনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল–

"মাএঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল।
না করিহ গোঠ সঘনে। সেহো বোল না শুনিল কানে ল।
আল হের বড়াই হে। তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে।। হে।।"[৯]

সুতরাং কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী চুরির কারন হিসেবে মনে করেন, তিনি মায়ের নিষেধ অমান্য করে গোষ্ঠে শয়ন করেছিলেন, আর সেই জন্যই তাঁর সাথে এরূপ হয়েছে। এটাও এক রকমের বিশ্বাস কিংবা সামাজিক বিধিনিষেধ (ট্যাবু) বলতে পারি। কিন্তু তা বলে এটা কোনো কুসংস্কার নয়। নারী ও পুরুষের ভাবনাগত ও ভাষাগত পার্থক্য উপরোক্ত রাধা ও কৃষ্ণের কথনে স্পষ্ট।

আমাদের সমাজে যেখানে বিবাহিত মেয়েদের নিজের স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা চলে না, সেখানে বড়ুর রাধা অনেকটা এগিয়ে। তিনি নিঃসংকোচেই বলেন 'সামী আইহন'। বর্তমান নারী শিক্ষার প্রসারে এই সংস্কার যদিও অনেকটাই লোপ পেয়েছে। কিন্তু নারীর যেহেতু নিজের কোনো পরিচয় সমাজ দেয়নি, অন্যের পরিচয়ই তার আশ্রয়, তাই, কাব্যে রাধা তাঁর নিজের পরিচয় একবারও 'চন্দ্রাবলী' বা 'রাধা' বলে উল্লেখ করেননি। 'আইহনের রানী', 'বড়ার বহুয়ারী', 'বড়ার ঝী' বলেই পরিচয় দিয়েছে। নারীর একমাত্র আশ্রয় যেহেতু পুরুষের চরণ, পুরুষের দাসী বলেই সে সমাজ গণ্য, তাই বড়াই রাধাকে 'আইহনের দাসী' বলেও সম্বোধন করেছেন।

আলোচ্য কাব্যে কৃষ্ণ তাঁর অহংকার, গর্ব, ক্ষোভ, রাগ ইত্যাদি সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। রাধা কিংবা বড়াই সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, শ্লেষ, সুরের ওঠানামা, নাটকীয়তা কিংবা কথার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির ব্যবহারে মনের ভাবকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বংশীখণ্ডের একটি পদের কিছু অংশ তুলে ধরা হল। যেখানে রাধার নাটকীয়তার ঢং এ ছলনা করে বলেছেন –

"বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী তার মন বুঝিতে না পারী
দুঠ মন মিঠ দেখে আত্ম সম পর দেখে চাহা বাঁশী তাক মুরারী।।

দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় দুখ মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।”[১০]

কথার মধ্যে আবার অনেক সময় উপমা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে তা আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। তৎকালীন সময়ে নারীর শিক্ষা-দীক্ষার সেরকম কোনো অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে এই প্রবাদ-প্রবচন কিংবা লৌকিক উপমার ব্যবহার ছিল নারীর নিজস্ব ক্ষেত্র। কৃষ্ণের কথনেও কিছু উপমার পরিচয় পাই কাব্যে। রাধার দেহ সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় তিনি অনেক উপমা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা সংস্কৃত উপমা। কিন্তু কাব্যে বড়াই কিংবা রাধার কথনে বড়ু কবি সচেতনভাবেই পল্লীজীবন থেকে সংগ্রহ করে, লৌকিক উপমার ব্যবহার করেছেন। যার মধ্যে নারী ভাষার স্বতন্ত্র সুর প্রকট হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীর ভাষায় লৌকিক প্রবাদ, উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে, কাব্যে রাধা ও বড়াইয়ের ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি উপমার উল্লেখ করা হল –

১) চাঁপাকুট়ী দেখিতে রুপসে। তাত নাহি গন্ধের পরসে।। ল।।
বিকসিলে মোহে মুণিমণে। হেন সব নারীর যৌবনে।। (দানখণ্ড)
২) বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন হাকল বিকল। জরুয়া দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল।। (দানখণ্ড)
৩) আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।। (দানখণ্ড)
৪) তপত দুধ নালে না পীএ জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ।
নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ।। (দানখণ্ড)
৫) আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি। সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী।।
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা। আলপ বয়সে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।। (ভারখণ্ড)
৬) বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী তাক নাহি কিছু পরকার।
ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন বড় মানে তিন উপকার।।
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল চঞ্চল দুঈহো পাড়িহাসে। (বৃন্দাবন খণ্ড)
৭) বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।। (বংশীখণ্ড)

সমগ্র কাব্যজুড়ে এরূপ অসংখ্য লৌকিক উপমা নারীর কথায় ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণের কথনে খুব কম পরিমাণে এরূপ উপমার ব্যবহার দেখতে পাই। নারীর ভাষায় ব্যবহৃত উপমার মতোই লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনের প্রাচুর্য রাধা ও বড়াইয়ের কথনে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল –

১) কার কাঁচ আলিতে না দেঁও মোএঁ পাএ
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।। (দানখণ্ড)
২) পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক। (দানখণ্ড)
৩) পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী। (দানখণ্ড)
৪) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। (দানখণ্ড)
৫) দেখিয়া সাধুর ধন চোর পুড়ি মরে। (ভারখণ্ড)
৬) কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত। (রাধাবিরহ)
৭) সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ কাহার বাপে (রাধাবিরহ)
৮) ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়িবাক পারী। উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।
যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট। তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।। (রাধাবিরহ)

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে এরূপ প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত আমরা কৃষ্ণের কথনেও পেয়ে থাকি, কিন্তু তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। সমাজেও মূলত মেয়েরাই এ সকল প্রবাদ-প্রবচন, উপমার ব্যবহার বেশি মাত্রায় করে থাকে। তাদের প্রবাদের মুখ্য বিষয় হয় পারিবারিক নানা সম্পর্কের তিক্ততা-মধুরতা, অভিমান-অভিযোগ, খেদ, বিভিন্ন

সামাজিক প্রথা, সতীত্ব, সতীন সমস্যা, পতিনিন্দা, নারীর রূপগুণ ইত্যাদি। পারিবারিক অনেক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে অনেক সময় মেয়েদের সরাসরি কথা বলা চলে না। সংযমের ফলে তাদের না বলা কথাগুলো মনের কুটীরে জমা হয়। সেই জায়গায় তারা সংক্ষেপে এই সকল প্রবাদের আশ্রয় নেয়। এখানে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কখনও কখনও তাদের মধ্যে বিদ্রুপ কিংবা রসিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং, সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়ে আদি মধ্য বাংলার এক এবং অন্যতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আমরা নারীর নিজস্ব কথনের প্রেক্ষিতে নারীর নিজস্ব ভাষার স্বরূপের সন্ধান পেলাম। একই সমাজে বাস করেও নারী ও পুরুষের ভাষায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুরের কোমলতা, ওঠানামা, নাটকীয় উপস্থাপন, অনুনয়, কাতরোক্তি, খেদ; দুর্ভাগ্যের জন্য কথায় কথায় বিধাতাকে ডেকে আনা, নিজেকে দোষারোপ, নিজের মৃত্যু কামনা করা, অসহায়তায় নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য অভিশাপান্তর শব্দের ব্যবহার করা ইত্যাদি নারীর ভাষায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে নারীর নিজের ভাষার এক স্বতন্ত্র স্বরূপের পরিচয় পাই। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরুষের ভাষায় খুব একটা চোখে পড়ে না। নারীর নিজের কথার মধ্য দিয়ে আরও ভালোভাবে নারীর সামাজিক অবস্থান, নারী মনস্তত্ত্বের গভীর ও জটিল দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়াই ও রাধার নিজস্ব কথনে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বড়ু কবি খুব সুন্দর ও নিঁখুতভাবে উপস্থাপন করেছেন। যার নিরিখে আমরা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে নারীর নিজস্ব বয়ানের প্রেক্ষিতে এক স্বতন্ত্র নারী ভাষার পরিচয় পেয়েছি।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', আশ্বিন, ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২০

২. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', আশ্বিন, ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৯৭

৩. তদেব, পৃ. ২১৫

৪. তদেব, পৃ. ২৫৫

৫. তদেব, পৃ. ২১৪

৬. তদেব, পৃ. ২০৮

৭. তদেব, পৃ. ৪৪৯

৮. তদেব, পৃ. ৩৯৫

৯. তদেব, পৃ. ৩৯৪

১০. তদেব, পৃ. ৩৯৬

Bibliography:

কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত', ফাল্গুন, মার্চ, ২০১৩, শিলালিপি ৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৯

চট্টোপাধ্যায়, অশোক, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সন্দর্শন', ১৪৩০, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

বসুদত্ত, শর্মিলা, 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা', ডিসেম্বর, ২০১৪, প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', আশ্বিন, ১৪২১, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

হুমায়ুন, রাজীব, 'সমাজভাষাবিজ্ঞান', ২০২৩, নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬